



বীর শহীদ

মো: মাহফুজ

জন্ম তারিখ:

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

শাহাদাতের তারিখ:

৫ আগস্ট, ২০২৪

বিভাগ:

ঢাকা

জেলা:

বগুড়া

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা :গার্মেন্টস কর্মী,

শাহাদাতের স্থান :শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

শহীদ মো: মাহফুজ (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২- আগস্ট ২০২৪) জুলাই বিপ্লবের শহীদ। তাঁর পিতার নাম জনাব মো: মজনু প্রাং এবং মাতার নাম মোছা: কাজল। ৫ আগস্ট বিজয় মিছিল চলাকালে আওয়ামী নরপিশাচদের নির্মমতার শিকার হন তিনি। ৫ই আগস্ট ২০২৪ সোমবার সৈরাচরী হাসিনা পালাবার আগমুহূর্তে দুপুর ১২ টার একটু আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেন। মিছিল আনসার একাডেমীর সামনে গেলে সৈরাচরী হাসিনা সরকারের পুলিশ ও আনসারের যৌথ বাহিনী ছাত্র জনতার দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে তখন শহীদ মাহফুজ বীর দর্পে সামনে আগাতে থাকে আনুমানিক ৪টার দিকে ঘাতক আনসার সদস্যের গুলিতে মাহফুজ গুলিবিদ্ধ হন। ছাত্র-জনতা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মডার্ন হাসপাতালে নেয়। অবস্থার অবনতি হলে তাত্ক্ষণিক ভাবে শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ব্যক্তিগত জীবন

শহীদ মাহফুজ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সালে বগুড়া জেলার জোড়াগাছা হাটের কুটুর বাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে এসএসসি পরীক্ষার পর তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের হাল ধরতে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। জীবিকার তাগিদে গাজীপুর শহরে আসেন এবং দীর্ঘদিন কাজ করেন। সর্বশেষ মৃত্যুর আগে তিনি ইন্টারস্টফ এ্যাপারেলস লিমিটেড এ সুইং ইনপুটম্যান হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। শহীদ মাহফুজ মৃত্যু কালে স্ত্রী, ১ কন্যা এবং বৃদ্ধা মা রেখে যান। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শেষ সম্বল বলতে পাঁচ শতাংশ জমি আছে এবং একটি ঘর আছে।

পারিবারিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মাহফুজ মৃত্যু কালে স্ত্রী, ১ কন্যা এবং বৃদ্ধা মা রেখে যান। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শেষ সম্বল বলতে পাঁচ শতাংশ জমি আছে এবং একটি ঘর আছে। তাঁর পিতা কৃষি কাজ করেন। নিজস্ব জমিজমা না থাকায় অন্যের জমিতে কাজ করেন। ছেলে চাকরি করে যে টাকা পাঠাত তা দিয়েই সংসার চলত। ছেলের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে চরম সংকট তৈরি হয়েছে।

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অবৈধ সরকার শেখ হাসিনা জনগণের ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করে। গুম-খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অন্যায়, জুলুম, অবিচার, অত্যাচার, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, অর্থ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। তাদের অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা পূর্বাপর সকল স্বৈরশাসককে ছাড়িয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ জনগণের মনে দানা বেঁধে উঠে। দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ আন্দোলনে রূপ লাভ করে। দলীয় পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে জনগণের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পুলিশের পৈশাচিকতা ৭১'র পাক হানাদার বাহিনীকেও ছাপিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলন রূপ নেয় স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে সরকার মারমুখি নীতি অবলম্বন করে।

“মুক্তিযুদ্ধের নাতি-পুত্রিরা মেধাবী না? যত সব রাজাকারের বাচ্চারা মেধাবী”

১৫ জুলাই রাতে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। তিনি বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের নাতি-পুত্রিরা মেধাবী না? যত সব রাজাকারের বাচ্চারা মেধাবী” মুহূর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে, “তুমি কে আমি কে?—রাজাকার, রাজাকার।” মুহূর্তেই ৭১'র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা মধ্য রাতে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গোষ্ঠা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। ১৬ জুলাই ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গোষ্ঠা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা টোকাইদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনদেরও রক্ষা মিলেনা। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটিতে থাকে। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ আন্দোলনকে শক্তি আরও বৃদ্ধি করে। অনেকটা আগুন ঘি ঢালার মত। এরপর থেকে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯ জুলাই বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঘাতক পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সম্মিলিত বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছুরা, ফাঁকা গুলি, গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সেদিন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ সাজোয়া যান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। শুধু তাই নয় স্বৈরাচারের হেলিকপ্টার ও উচু ভবনের উপর থেকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনার সংবাদ যেন বহির্বিশ্বে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য সরকার ১৯ জুলাই রাত ১০ টায় সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। দলীয় কর্মীদের দ্বারা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙচুর করে আন্দোলকারীদের উপর দায় চাপানোর নোংরা রাজনীতি শুরু করে।

ডিবি অফিসে নিয়ে অত্যাচার

ডিবি অফিস ছিল টর্চার সেল। আর এই টর্চার সেলের গড ফাদার ছিল ডিবি হারুন। আওয়ামী সরকারের মদদ পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে ডিবি হারুন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল একএক করে তুলে এনে হাজির করা হয় ডিবি হারুনের টর্চার সেলে। সেখানে তাদেরকে অকথ্য নির্যাতন করা হত। নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, তা সহ্য করতে না পেরে সেগুলোতে হয়ে যায় অনেক। সেসব ফিরে আসলে তাদেরকে আবার নির্যাতন করা হত। অস্ত্র ঠেঁকিয়ে জীবন কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পানিতে মরিচের গুড়া মিশিয়ে তারপর পান করতে দেওয়া হত। অভ কোষে পা দিয়ে লাথি মারত। উপর দিক করে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে পেটানো হত। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাত এবং পা ভেঙ্গে দেওয়া হত। শুধু তাই নয় ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হত। এসবের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাপ প্রয়োগ করত।

মাহফুজের শহীদ হওয়ার ঘটনা

৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার স্বৈরাচারী হাসিনা পালানোর আগমুহূর্তে ১২ টার একটু আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেন। মিছিল সফিপুর আনসার একাডেমীর সামনে গেলে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পুলিশ ও আনসারের যৌথ বাহিনী ছাত্র জনতাকে টার্গেট করে গুলি ছুঁতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে, তখন শহীদ মাহফুজ বীর দর্পে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে একের পর এক সাধারণ মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। মাটিতে পড়ে কাতরভাবে থাকে আহত মানুষ গুলো। একটু পানি দেওয়ার মত কোন মানুষ সেদিন সেখানে ছিল না। চারদিকে মরা লাশ। বীর দর্পে দাড়িয়ে আছে শহীদ মাহফুজ। এত মৃত মানুষ দেখে সেদিন নিজের জীবনকে অতি তুচ্ছ মনে হয় তাঁর কাছে। জীবনের মায়া সেদিন মাহফুজকে পালিয়ে যেতে দেয়নি। আনুমানিক ৪টার দিকে এক ঘাতক আনসার সদস্যের গুলিতে মাহফুজ গুলিবিদ্ধ হন। মাহফুজের নিখর দেহ সেদিন রাস্তার উপরেই পরে ছিল দীর্ঘক্ষণ। ছাত্র-জনতা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মডার্ন হাসপাতালে নেয়। অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিক ভাবে শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। একজন নিরপরাধ মানুষের জীবন এভাবেই কেড়ে নেয় শত্ৰুদের দল।

দাফন

শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে লাশ সংগ্রহ করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই জানাজা এবং দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ মাহফুজের প্রতিবেশী মোঃ সুমন মিয়া বলেন, আমরা একসাথে চাকরি করতাম। আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। তিনি খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। সহীহভাবে কোরান শিক্ষা নিয়েছেন এবং কোরান খতম করেছেন কয়েকবার।

একনজরে শহীদ মোঃ মাহফুজ

নাম : শহীদ মোঃ মাহফুজ

পেশা : গার্মেন্টস কর্মী

জন্ম তারিখ : ০৬-০২-১৯৯২

বয়স : ৩১ বছর

পিতা : মোঃ মজনু প্রাং

মাতা : মোসাঃ কাজল

শাহাদাতের তারিখ : ৫ আগস্ট ২০২৪

শাহাদাতের স্থান : শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কুটুরবাড়ি, ইউনিয়ন: জোড়গাছাছাট, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া

বর্তমান ঠিকানা : বাসা নং-১৪৭, ছাত্রগেট রফিক বাজার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

শহীদ সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের বাণী

তারা তাদের রবের দেওয়া অনুগ্রহে আনন্দিত, এবং যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তাদের জন্যও তারা সুসংবাদ গ্রহণ করে। (সুরা আলে ইমরান ৩:১৭০)

হাদীস শরীফ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের জন্য জামাতে ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকবে।” (সুনান আবু দাউদ ২৫২০)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

